প্রেসিডেন্সি ক্রমশ মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে

মইদুল ইসলাম

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুস্বাস্থ্যের শর্ত: গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষা, মতামত শোনা, আলোচনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান চালানো। কোনও বিশ্ববিদ্যালয় এই নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে না। প্রেসিডেন্সিও না।

উপাচার্য *(নীচে)* **এবং মুখ্যমন্ত্রী** *(উপরে)*। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়। অগস্ট ২০১৫। *ছবি: সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়*

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র তান্ডবের জন্য রাগ করা উচিত। সেই অভব্যতাকে তিরস্কার করা উচিত। নাগরিক সমাজ কঠোর ভাষায় সেই নিন্দা করায় অনুতপ্ত ছাত্ররা জনসমক্ষে ক্ষমাও চেয়েছে। কিন্তু এক হাতে তালি বাজে না। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি যে এত খারাপ হয়ে গেল, তাতে কর্তৃপক্ষের কোনও দায় নেই? তাঁরা কবে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইবেন? বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে গিয়ে যে ভুলের পর ভুল হচ্ছে, কবে সেগুলো শুধরে নেবেন? 'কোনও ভুল করিনি' জাতীয় বালখিল্য অহমিকা প্রদর্শন কবে তাঁরা বন্ধ করবেন?

প্রেসিডেন্সিতে গত দেড় বছরে এমন বহু ঘটনা ঘটেছে যা কোনও গৌরবময়, ঐতিহ্যশালী প্রতিষ্ঠানের অশেষ লজ্জার কারণ। ২০১৩ সালের এপ্রিলে শাসক দলের পতাকা হাতে কিছু 'বহিরাগত'র প্রেসিডেন্সি হামলার পর আজ পর্যন্ত দোষীদের শাস্তি হয়নি। প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ এক মস্ত বড় লজ্জা। সে লজ্জার দায় কার?

প্রেসিডেন্সির ছাত্রদের অভব্য আচরণকে কেউ কেউ 'এলিটের গুন্ডামি' বলছেন। যে কোনও গুন্ডামিই আপত্তিকর। কিন্তু সেই গুন্ডামি বাদ দিলে প্রেসিডেন্সিতে যে 'এলিট'-এরই সব রকমের অন্যান্য দাপট, সে বিষয়ে তো কারও মাথাব্যথা নেই? এই বছর প্রেসিডেন্সিতে স্নাতকোত্তর ভর্তি পরীক্ষায় বাংলা মাধ্যমের পড়ুয়াদের খাতা দেখাই হল না, স্নাতক স্তরের ভর্তিতেও বাংলা মাধ্যমের ছাত্রছাত্রীদের বাদ দেওয়ার প্রবণতা দেখা গেল। এই ভাবনা গত বছর জুন মাস থেকে শুরু হয়েছিল, এই বছর তা পালিত হল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষর চাপে। সমস্ত বিভাগীয় প্রধান সেই চাপের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হলেন। গত কয়েক দশকে শহর, মফস্সল ও গ্রাম থেকে বাংলা মাধ্যমে পড়াশোনা করে অনেক কৃতী ছাত্রছাত্রী প্রেসিডেন্সিতে এসেছেন। অনেকেই পরবর্তী কালে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তা হলে আজ বাংলা মাধ্যমের পড়ুয়াদের ব্রাত্য করার সিদ্ধান্ত অন্যায় নয়? জনগণের টাকায় চালিত প্রতিষ্ঠানে কেন সমাজের সব অংশের মেধাবী পড়ুয়াদের জায়গা হবে না?

গত বছর অর্থনীতির বিভাগীয় প্রধান প্রেসিডেন্সি ছেড়ে যাদবপুরে ফিরে গেলেন। দর্শনের বিভাগীয় প্রধান প্রেসিডেন্সি ছেড়ে রাজারহাট কলেজে চলে গেলেন। সংখ্যাতত্ত্ব, রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের একাধিক অধ্যাপক কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলে গেলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে 'পড়াশোনার পরিবেশ নেই' বলে এক বিখ্যাত বিজ্ঞানী তাঁর পুরানো কর্মস্থলে ফিরে গেলেন। ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি ছাত্র পড়াবেন বলে প্রেসিডেন্সির উপাচার্য হতে চাননি। তিনি যখন প্রকাশ্যে বললেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বহুত্ববাদ' নেই (যা সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশের পক্ষে জরুরি) তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে চিন্তা জরুরি ছিল, সেটা হয়েছিল কি? আর এক খ্যাতনামা বিজ্ঞানী, পদার্থবিদ্যার বিভাগীয় প্রধান দেশের অন্য এক বিজ্ঞান-পীঠস্থানে অধিকর্তা হয়ে চলে গেলেন। ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি বহু বার প্রেসিডেন্সির বহু সমালোচনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। যাওয়ার সময় তাঁকে সামনে বসিয়ে কর্তৃপক্ষ সংবাদমাধ্যমে মন্তব্য করলেন: কেউ অপরিহার্য নয়! এ কার অসম্মান?

সম্প্রতি ইতিহাসের বিভাগীয় প্রধান চাকরি থেকে ইস্তফা দিলেন। ডিন অফ স্টুডেন্টস চাকরি ছেড়ে দিলেন। প্রেসিডেন্সিতে চাকরি পাকা হওয়া সত্ত্বেও কিছু অধ্যাপকের অন্যায় বদলি হল। উদাহরণস্বরূপ, প্রাক্তন রেজিস্ট্রার, ভূতত্ত্বের এক অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান, বাংলার বিভাগীয় প্রধান, অঙ্কের বিভাগীয় প্রধান এবং জীববিজ্ঞানের দুই অধ্যাপকের নাম করা যায়। এঁরা অনেকেই অভিজ্ঞ শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অনেক গঠনমূলক কাজ করেছেন। অথচ এঁদের জন্য কিছু না করেও পাশাপাশি অন্য কিছু শিক্ষককে বদলি না করিয়ে সরকারি কর্মীর দায়ভার থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল। একই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রতি দু'রকম আচরণ: কেন?

কয়েক মাস ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা নিয়ে অযথা বিতর্কে ভর্তি প্রক্রিয়া বিলম্বিত হল। বহু ছাত্রছাত্রী অ্যাডমিট কার্ড পেলেন না। শেষ মুহূর্তে পরীক্ষাস্থল পরিবর্তনের জন্য হয়রানির শিকার হলেন ছাত্রছাত্রীরা। প্রশ্ন ছাপার ভুল হল। ভর্তি প্রক্রিয়া জটিল করার জন্য কিছু সংরক্ষিত আসন খালি থাকল। এই সব ঘটনায় লজ্জার কারণ নেই?

বোর্ড অফ স্টাডিজ শিক্ষাগত ব্যাপারে যা সুপারিশ করে, সব বিশ্ববিদ্যালয়েই কর্তৃপক্ষ সচরাচর তা মেনে নেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধানকে বদলি করার কিছু পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বৈঠক হল। সেই বৈঠকে কর্তৃপক্ষ বললেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধানকে কী ভাবে অতিথি শিক্ষক হিসেবে নিয়ে আসা যায়, ভেবে দেখা হবে। বলা হল যে আর কেউ যাতে বদলি না হয়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সেটাই অগ্রাধিকার হবে। অথচ বৈঠকের দু'মাসের মধ্যে জীববিজ্ঞানের দুই অধ্যাপক আর অঙ্কের বিভাগীয় প্রধানকে বদলি হলেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বোর্ড অফ স্টাডিজ যখন প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধানের নাম অতিথি শিক্ষক হিসেবে সুপারিশ করলেন, কর্তৃপক্ষ তা মানলেন না। এই তুঘলকি আচরণ কি কিছু কম লজ্জার?

২০১৪-র শেষে ঢাকঢোল পিটিয়ে শিক্ষকদের মূল্যায়নের জন্য ছাত্রছাত্রীদের কাছে মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল। পৃথিবীর অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই যেমন ঘটে থাকে, প্রচুর ছাত্রছাত্রী সেই মতামত দিলেন। আট মাস পর আজও ছাত্রদের সেই মূল্যায়নের কথা জানতে পারলাম না। আমরা শিক্ষকরা কেমন পড়াই, তা জানার অধিকার কি আমাদের নেই? জুন মাসে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের একটি দলিলের উদ্ধৃতি দিয়ে পঞ্চাশ মিনিটের ক্লাসকে এক ঘন্টা করার অনুরোধ করা হয়, আর শিক্ষকদের বছরে ছয় সপ্তাহ ছুটি দেওয়ার অনুরোধ করা হল। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এক লাইন প্রাপ্তি স্বীকারের সৌজন্যটুকুও পাওয়া যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয় চালানোর জন্য কর্তৃপক্ষের বিশ্বাসযোগ্যতা ও স্বচ্ছতা নিয়ে কাজ করার দরকার নেই? বহু শিক্ষক প্রেসিডেন্সিতে পড়ানোর স্বপ্ন ও আবেগ নিয়ে অধ্যাপনা শুরু করেছিলেন। তাঁদের আগ্রহে আজ ভাটার টান।

গত বছর মে মাসে এক অদ্ভূত ফতোয়া জারি হয়েছিল: সংবাদমাধ্যমে কথা বলতে গেলে কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি চাইতে হবে। এই ফতোয়া কি সাংবিধানিক? অথচ কর্তৃপক্ষ নিজে কিন্তু সাংবিধানিক রীতিনীতি না জেনেই সংবাদমাধ্যমে অবলীলাক্রমে বিবৃতি দিচ্ছেন। প্রবাদপ্রতিম মানুষদের সাম্মানিক ডিলিট উপাধি 'পরে দিয়ে দেব' ধরনের বক্তব্য পেশ করছেন। এতে প্রেসিডেন্সির সম্মান হানি নেই? একমাত্র বাঁচোয়া যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন্টর গ্রুপ ছাত্রদের অভব্যতাকে যেমন তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন, তেমনই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে শিক্ষার উৎকর্ষের সন্ধানে প্রেসিডেন্সিকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিটি পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

মার্চ পর্যন্ত সমস্ত অধ্যাপকদের নিয়ে একটা সভা হত, যদিও সেই সভার 'মিনিটস' হত না। কিছু আলোচনা, কিছু সিদ্ধান্ত কেবল। মাঝে মাঝে কমিটি বানানো হত যাদের সুপারিশটুকুও পালন করা হত না। যা হোক, তবু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শিক্ষকদের আলোচনার একটা জায়গা থাকত। আর এখন? ফাকাল্টি কাউন্সিল পুরোটা গঠিত হয়নি। শিক্ষকদের কথা বলার স্বাধীন প্লাটফর্ম নেই। দমবন্ধ পরিবেশে স্তাবক-পরিবেষ্টিত কর্তৃপক্ষ খেয়ালখুশিমতো চলছে। দার্শনিক উইটগেন্স্টাইন বলেছিলেন, আমরা যা সম্পর্কে কিছু বলতে পারি না সেই বিষয়ে নীরব থাকাই যায়। কিন্তু নীরবতাও কথা বলে, যা শোনার জন্য সহমর্মিতা ও ধৈর্য প্রয়োজন। কোনওটিই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কর্তৃপক্ষের নেই। এই প্রতিষ্ঠান তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে। এই মৃত্যু আটকানোর পূর্বশর্ত, গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষা, মতামত শোনা, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান চালানো। কোনও বিশ্ববিদ্যালয় এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে না। প্রেসিডেন্সিও না।

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি যে এত খারাপ হয়ে গেল, তাতে কর্তৃপক্ষের কোনও দায় নেই? তাঁরা কবে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইবেন?

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক

ABP 16/09/2015